ঘর! ছোট্ট এই শব্দের মাঝে লুকিয়ে আছে মানুষের পার্থিব জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও অপরিহার্য অধ্যায়, পরিচয় আর ঠিকানা। ঘর নিয়ে রচিত হয়েছে কত শত গান, কবিতা, গল্প, উপন্যাস। সেসব লেখায় হয়তো লেখকের স্মৃতিময় আবেগের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে কিন্তু গৃহহীন মানুষের নিদারুন যন্ত্রণা, খোলা আকাশের নিচে কিংবা রাস্তার ধারে রাত জাগা ঠিকানাহীন মানুষের বোবা কান্না ফুটে উঠেনি যথার্থভাবে। গৃহহীন মানুষের বছরের পর বছর ধরে বয়ে চলা দুঃখ, দুর্দশা হৃদয়ে ধারন করেই মাননীয় প্রধানমন্ত্রী গ্রহণ করেছেন স্বপ্নের "আশ্রয়ণ প্রকল্প।"

আজ থেকে ৫০ বছর আগে সদ্য স্বাধীন বাংলাদেশে জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তৎকালীন নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষীপুর জেলার রামগতি উপজেলার চর পোড়াগাছা গ্রামে একটি গুচ্ছগ্রাম প্রকল্পের উদ্বোধন করে অসহায় ছিন্নমূল মানুষের আশ্রয়ের ব্যবস্থা করেন। স্বাধীনতার পাঁচ দশক পরে এখন সেই গুচ্ছগ্রামের অনেক সড়ক পাকা। রাস্তার দু'ধারের বাড়িগুলোর বেশিরভাগই ইটের। বাড়ির উঠানে নারিকেল, সুপারি, বড়ই, পেয়ারা সহ নানা প্রজাতির গাছ। স্বাধীনতাপূর্ব দুর্যোগের অভিঘাতে ক্লিষ্ট জনপদ এখন মানুষের স্বপ্নের ভূমি।

এরই ধারাবাহিকতায় বঙ্গবন্ধুর স্বপ্নের সোনার বাংলা গড়ে তুলতে ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের জন্য আশ্রয়ণের স্বপ্ন বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে অসহায় মানুষের ভরসার কান্ডারী বঙ্গবন্ধুকন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা "আশ্রয়ণ প্রকল্প" শুরু করেন।

আশ্রয়ণ প্রকল্পের পটভূমিঃ

জাতির পিতা বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমানের হাত ধরে ১৯৭২ সালের ২০ ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালী, বর্তমান লক্ষীপুর জেলার, রামগতি উপজেলার, চরপোড়াগাছা গ্রামে ভূমিহীন-গৃহহীন, অসহায় ছিন্নমূল মানুষের পুনর্বাসন কার্যক্রম শুরু হয়। ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট দেশি ও আন্তর্জাতিক চক্রান্তের মাধ্যমে স্বাধীনতাবিরোধী চক্র বঙ্গবন্ধুকে সপরিবারে নির্মমভাবে হত্যা করার পর দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন পরিবার পুনর্বাসনের মতো জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো স্থবির হয়ে পড়ে।

বঙ্গবন্ধু হত্যার দীর্ঘ ২১ বছর পর তাঁর সুযোগ্য কন্যা মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা ১৯৯৬ সালে রাষ্ট্র পরিচালনার দায়িত্ব গ্রহন করে বঙ্গবন্ধুর জনবান্ধব ও উন্নয়নমূলক কার্যক্রমগুলো পুনরায় শুরু করেন। তাই তিনি "অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের মডেল" সামনে এনে পিছিয়ে পড়া ছিন্নমূল মানুষকে মূলধারায় আনার জন্য বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৯৭ সালে বঙ্গবন্ধুকন্যা কক্সবাজার জেলায় সেন্টমার্টিনে প্রবল ঘুর্ণিঝড়ে ক্ষতিগ্রস্থ মানুষের পুনর্বাসনের উদ্যোগ নেন এবং একই বছর তিনি সারা দেশের গৃহহীন-ভূমিহীন মানুষকে পুনর্বাসনের লক্ষ্যে প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের তত্ত্বাবধানে শুরু করেন "আশ্রয়ণ প্রকল্প।"

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উদ্দেশ্যঃ

১। ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল অসহায় দরিদ্র জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসন

২। প্রশিক্ষণ ও ঋণ প্রদানের মাধ্যমে জীবিকা নির্বাহে সক্ষম করে তোলা

৩। আয়বর্ধক কার্যক্রম সৃষ্টির মাধ্যমে দারিদ্র দূরীকরণ

আশ্রয়ণ প্রকল্পের উপকারভোগী:

'ক' শ্রেণির পরিবার: সকল ভূমিহীন, গৃহহীন, ছিন্নমূল, অসহায় দরিদ্র পরিবার।

'খ' শ্রেণির পরিবার: সর্বোচ্চ ১০ শতাংশ জমির সংস্থান আছে কিন্তু ঘর নেই এমন পরিবার।

প্রাথমিকভাবে 'ক' শ্রেণির পরিবারের জন্য অগ্রাধিকার ভিত্তিতে সরকারি নিস্কন্টক খাসজমি, সরকারিভাবে ক্রয়কৃত জমি, সরকারের অনুকূলে কারও দানকৃত জমি অথবা রিজিউমকৃত জমিতে ভূমিহীন ও গৃহহীনদের পুনর্বাসন করা হচ্ছে।

দারিদ্র বিমোচনে অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন; "শেখ হাসিনা মডেল":

একটি গৃহ কীভাবে সামগ্রিক পারিবারিক কল্যাণে এবং সামাজিক উন্নয়নের প্রধান হাতিয়ার হতে পারে তার অনন্য দৃষ্টান্ত "আশ্রয়ণ প্রকল্প" অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়ন তথা দারিদ্র্য বিমোচনের এই নতুন পদ্ধতি ইতোমধ্যে "শেখ হাসিনা মডেল" হিসেবে পরিচিতি পেয়েছে। শেখ হাসিনা মডেলের **আওতায়** সমাজের সুবিধাবঞ্চিত মানুষগুলোকে উন্নয়নের মূলধারায় নিয়ে আসার জন্য বিভিন্ন কার্যক্রম শুরু হয়েছে। সমাজের মূলধারার মানুষের সাথে উদ্বাস্তু, তৃতীয় লিঙ্গ, ভিক্ষুক, বেদে, দলিত, হরিজনসহ সমাজের পিছিয়ে পড়া অন্যান্য সম্প্রদায়ের মানুষের জন্যও জমিসহ ঘর প্রদান করা হচ্ছে। শিক্ষা, স্বাস্থ্য ও কর্মসংস্থানের সুযোগ তৈরি করার মাধ্যমে তাদেরকে অর্থনৈতিক উন্নয়নের মূলধারায় অন্তর্ভূক্ত করা হচ্ছে।

"শেখ হাসিনা মডেল" এর বৈশিষ্ট্য:

১। উপার্জন ক্ষমতা ও সঞ্চয় বৃদ্ধি করে অর্থনৈতিকভাবে স্বাবলম্বী করা

২। সম্মানজনক জীবিকা ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা করা

৩। নারীদের জমিসহ ঘরের অর্ধেক মালিকানা দিয়ে নারীর ক্ষমতায়ন করা

৪। প্রশিক্ষণের মাধ্যমে দক্ষতা ও সক্ষমতা বাড়িয়ে মানবসম্পদ উন্নয়ন করা

৫। ব্যাপক হারে বনায়ন ও বৃক্ষরোপণ করে পরিবেশের উন্নতি সাধন করা

৬। গ্রামেই শহরের সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা

চলমান অর্থনৈতিক উন্নয়ন দীর্ঘ মেয়াদে টেকসই করার উত্তম চর্চা হিসেবে সমাদৃত হয়েছে "অন্তভূর্ক্তিমূলক উন্নয়নের শেখ হাসিনা মডেল"। এরই ধারাবাহিকতায়, "আশ্রয়ণ প্রকল্পের" মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী ভূমিহীন-গৃহহীন-ছিন্নমূল মানুষকে অন্তভূর্ক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় এনেছেন। সমাজের অনগ্রসর পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে ২ শতক জমির মালিকানাসহ সেমিপাকা একক ঘর প্রদান করা হচ্ছে।

জমিসহ ঘরের মালিকানা পেয়ে তারা অর্থনৈতিক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় নিজেদের নিয়োজিত করছেন। ফলে এসকল পিছিয়ে পড়া মানুষের জীবনমান উন্নত হচ্ছে। উন্নয়নের মূলধারায় নারীদেও সম্পৃক্ত করার ও নারীর ক্ষমতায়ন নিশ্চিতকরণে আশ্রয়ণের বাড়ি ও জমির মালিকানা স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে দেয়া হচ্ছে। পুনর্বাসিত পরিবারের সদস্যদের উৎপাদনমুখী নানা বিষয়ে প্রশিক্ষণ দেয়া সহ সঞ্চয়ী হতেও প্রশক্ষিণ প্রদান করা হচ্ছে। দেশের মানবসম্পদ উন্নয়নের লক্ষ্যে উপকারভোগীদের বিভিন্ন উৎপাদনমূখী প্রশিক্ষন প্রদানের মাধ্যমে কর্মক্ষেত্রে দক্ষতা ও সক্ষমতা বৃদ্ধি করা হচ্ছে। উপকারভোগীরা তাদের বসতবাড়ির

অঙিনায় সবজি চাষ, বৃক্ষরোপণসহ প্রকল্পের পুকুরে মাছ চাষ করে নিজেদের জীবনমানের ও একই সাথে পরিবেশের উন্নয়ন করছে। প্রতিটি একক ঘরে বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সুপেয় পানির সুব্যবস্থার মাধ্যমে উপকারভোগীদের জন্য আধুনিক নাগরিক সুযোগ-সুবিধা নিশ্চিত করা হচ্ছে।

মুজিববর্ষে আশ্রয়ণঃ

মুজিববর্ষে 'বাংলাদেশের একজন মানুষও গৃহহীন থাকবে না' মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এ নির্দেশনা বাস্তবায়নে আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের সকল ভূমিহীন ও গৃহহীন মানুষের বাসস্থান নিশ্চিতকল্পে সেমিপাকা একক গৃহনির্মানের কর্মসূচি হাতে নেওয়া হয়। সমগ্র দেশের সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে মুজিববর্ষে জমিসহ সেমিপাকা ঘর দেওয়ার লক্ষ্য নির্ধারণ করা হয়।

এ লক্ষ্যে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর ঘোষণা বাস্তবায়নে অর্ন্তভুক্তিমূলক উন্নয়নের আওতায় বরগুনা জেলার খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে পূনর্বাসনের মাধ্যমে তৃতীয় লিংগের মতো সমাজে নিগৃহীত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে অর্ন্তভুক্ত করা হয়ছে সমাজের মূলস্রোতে। তাদের সাথে একই ভূ-খন্ডে বাস করছে স্বামী পরিত্যক্তা, পুর্নবাসিত ভিক্ষুক, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তিসহ বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণের অন্যান্য ভূমিহীন ও গৃহহীন প্রান্তিক জনগোষ্ঠী।

খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প, বরগুনাঃ

সমুদ্র উপকূলবর্তী জেলা বরগুনা। ভাঙ্গন, বন্যা, জলোচ্ছাস, সাইক্লোন এই এলাকার মানুষের নিত্যসঙ্গী। প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে প্রতিবছরই অনেক মানুষ তাদের ভিটেমাটি হারিয়ে নিঃস্ব হয়ে পড়ে। তাদের স্থান হয় কখনো সরকারি বেড়িবাঁধ কিংবা পতিত খাস জমিতে। তাদের জীবন চলে অন্যের দয়ায় এবং সহানুভূতিতে।

অন্যদিকে সকল নাগরিক সুবিধা ভোগের অধিকার সমভাবে প্রাপ্য হলেও তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী পারিবারিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিকভাবে বৈষম্যের শিকার। তাদের প্রতি সদয় আচরণ ও তাদের ন্যায্য অধিকার প্রতিষ্ঠায় সচেষ্ট হওয়া পরিবার, সমাজ ও রাষ্ট্ররে সকলের দায়িত্ব। অবহেলিত ও অনগ্রসর এ জনগোষ্ঠীর মৌলকি অধিকার সংরক্ষণ, তাদের জন্য সামাজিক ন্যায়বিচার নিশ্চিতকরণ, তাদের পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণ অত্যন্ত জরুরী।

সংবিধানের ১৯ অনুচ্ছেদ অনুসারে রাষ্ট্রীয় সকল স্তরে বাংলাদেশের নাগরিক হিসেবে সুযোগের সমতা লাভ করা তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীদের সাংবিধানিক অধিকার। সমাজে পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে মূলস্রোতধারায় সম্পৃক্তকরণে সরকার বিভিন্ন সময়ে নানামুখী পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর অর্ন্তভুক্ত করাসহ কর্মসংস্থানের জন্য বিভিন্ন উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তবে ঠিকানাহীন, পরিচয়হীন হওয়ায় ক্ষুদ্র এ জনগোষ্ঠী সরকারি সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছে। এ অবস্থা থেকে উত্তরণের জন্য প্রয়োজন এদেরকে সমাজের মূলস্রোতধারায় অর্ন্তভুক্তির মাধ্যমে পুনর্বাসনের কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ।

আর এই উদ্দেশ্যেকে ধারণ করেই জেলা প্রশাসন, বরগুনা বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও পেশার মানুষের সাথে তৃতীয় লিঙ্গের ২৫ জন সদস্যকে একই আঙিনায় বসবাসের সুযোগ করে দেওয়ার কার্যকর উদ্যোগ গ্রহণ করেছে। তারা সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির

এক অনন্য ছোঁয়ায় নতুন ঠিকানার সাথে পেয়েছে নতুন এক জীবন; যে জীবনে অন্য সাধারণ মানুষের মত তারা লাভ করছে সকল ধরণের সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাষ্ট্রীয় সুবিধা।

খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের যাত্রা শুরুঃ

সারা দেশের মত বরগুনার ৬টি উপজেলায়ই জেলা প্রশাসনের তত্ত্বাবধানে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ণ প্রকল্পের কাজ চলমান রয়েছে। এ পর্যন্ত বরগুনায় আশ্রয়ণ প্রকল্পের অধীনে দুই হাজারের অধিক ঘর নির্মিত হয়েছে। নির্মানাধীন রয়েছে আরও হাজার দেড়েক। তারই ধারাবাহিকতায় গত বছরের ২৬ এপ্রিল বরগুনা জেলার মুজিববর্ষের ৪১১ টি পরিবারকে ২ শতাংশ জমির মালিকানাসহ ঘর হস্তান্তরের শুভ সূচনা করেন মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা।

বরগুনার খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প প্রায় সাড়ে ১১ একর জমির উপর নির্মিত। যেখানে ইতোমধ্যে বানানো হয়েছে ৩২৯ টি ঘর। নির্মাণাধীন ১৫০ টির ঘর হস্তান্তরের অপেক্ষায়। ঘরগুলোতে দেয়া হয়েছে লাল সবুজের আবরণ। এক পলকে দেখলে মনে হবে যেন এক টুকরো বাংলাদেশ। যেখানে আশ্রয় পেয়েছে বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও সম্প্রদায়ের পাশাপাশি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষ। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারায় ফিরিয়ে আনতে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার উপহার খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে জমিসহ ঘর পেয়েছে হিজড়া সম্প্রদায়ের ২৫ জন মানুষ।

দেশের সর্ববৃহৎ আশ্রয়ণ প্রকল্প খাজুরতলায় শুধুমাত্র গৃহহীন এবং ভূমিহীন মানুষকেই আশ্রয় দেওয়া হয়নি বরং সমাজে যারা সবচেয়ে নিগৃহীত ও অবহেলিত, সমাজে যারা পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী, যারা নানাবিধ বৈষম্যের শিকার তাদেরকেই এখানে পুনর্বাসিত করা হয়েছে। যার মাধ্যমে সকল ভূমিহীন, গৃহহীন মানুষরা একসাথে তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সঙ্গে সৌহার্দ্য ও সম্প্রীতির মেলবন্ধনে অপূর্ব এক অসাম্প্রদায়িক বাংলাদেশের যোজনা করেছেন। এক মহল্লায় একত্রে থাকার ফলে তাদের মাঝে পারস্পরিক সহযোগিতার পথ সুগম হয়েছে এবং সার্বিক অর্থেই অনেকের জীবন যাপনের মান উন্নত হয়েছে।

এক নজরে খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ

এই প্রকল্পে মোট জমির পরিমাণ ১১.৪৫ একর যা উদ্ধারকৃত খাসজমি। এখানে প্রথম ধাপে ৩২৯ টি ও দ্বিতীয় ধাপে আরও ১৫০টি গৃহনির্মাণ করা হয়েছে। এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে ইতিমধ্যে যারা পুনর্বাসিত হয়েছে তাদের মধ্যে ২২ জন তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, ১০ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুক, ২০ জন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, ২৭ জন স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা, ৪১ জন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ এবং তারা সকলে মিলেমিশে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতিসহ একটি ভাতৃপ্রতিম বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে এক অনন্য নজির স্থাপন করেছে। এক আঙ্গিনায় বিভিন্ন ধর্ম ও বর্ণের মানুষের এমন পাশাপাশি বসবাসের মধ্যদিয়ে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির যে উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত স্থাপিত হয়েছে সেটিই বাঙ্গালির চেতনার শাশ্বত চিত্র। এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে তৃতীয় লিঙ্গের মত সমাজের নিগৃহীত, অবহেলিত জনগোষ্ঠি উঠে এসছে সমাজের মূল স্রোতে। তাদের সাথে অন্যান্য যারা ভূমিহীন, গৃহহীন রয়েছেন তারা সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তৈরি করেছেন একটি সুস্থ্য, সুন্দর বসবাসের উপযোগি সামাজিক পরিবেশ। পারস্পারিক ভালবাসায় সৌহার্দের বার্তা ছড়াচ্ছেন প্রতিদিন। এখানে বুনছে সুন্দর আগামীর

স্বপ্ন। অন্তর্ভূক্তিমূলক এই সমাজব্যবস্থার মধ্যদিয়ে ঐক্যের ধারনাকে সামাজিকভাবে গ্রহণ ও আলিঙ্গনের মাধ্যমে উন্মোচিত হয়েছে সম্ভাবনার নতুন দিগন্ত। তৈরি হয়েছে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং বসবাসের উপযোগী সামাজিক পরিবেশ।

খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প কেন অনন্য:

জেলা প্রশাসন, বরগুনা কর্তৃক গৃহীত তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীর পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতধারায় আনয়নের এই উদ্যেগটি দেশের অন্যান্য স্থানে তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসনের উদ্যোগ থেকে সম্পূর্ণ ভিন্ন এবং ব্যতিক্রম। বাংলাদেশের কয়েকটি স্থানে সরকারি ও বেসরকারি উদ্যোগে তৃতীয় লিঙ্গসহ সমাজের অন্যান্য প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে পুনর্বাসিত করা হলেও সেইসব পুনর্বাসন উদ্যোগসমূহে প্রত্যেক সম্পদায়ের ছিল আলাদা আলাদা বসবাস এবং অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতধারায় আত্তীকৃত হওয়ার সুযোগ-বঞ্চিত। কিন্তু বরগুনার খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে হিজড়া জনগোষ্ঠীসহ বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও পেশার জনগোষ্ঠীর একই আঙিনায় পাশাপাশি বসবাসের মধ্য দিয়ে পারস্পরিক সৌহার্দ্য ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এক অনন্য নজির স্থাপিত হয়েছে যা বাংলাদেশে এই প্রথম। হিজড়া জনগোষ্ঠীর সমাজের সকল ধর্ম, বর্ণ ও পেশার সাধারণ মানুষের সাথে সম্প্রীতিমূলক সহাবস্থানের মাধ্যমে মূলধারার জনস্রোতে একীভূত হওয়ার এমন সুযোগ একটি অনন্যসাধারণ উদাহরণ হিসাবে রূপ লাভ করেছে। একইসাথে এই উদ্যোগটি মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়নের স্বপ্ন বাস্তবায়নের পথে দূরদৃষ্টিসম্পন্ন একটি পদক্ষেপ।

অধিকন্তু জেলা প্রশাসনের এ উদ্যোগের ফলে সমাজ থেকে নিগৃহীত হয়ে বেঁচে থাকার তাগিদে মাদক ব্যবসায় সম্পৃক্ত হওয়া, চাঁদাবাজি, ভিক্ষাবৃত্তি, আপত্তিকর

যৌন আচরণসহ নানাবিধ অপরাধমূলক ও অসম্মানজনক কাজে ও পেশায় লিপ্ত তৃতীয় লিঙ্গের এ জনগোষ্ঠী আজ সমাজে সম্মানজনকভাবে সুপ্রতিষ্ঠিত।

বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ ও শ্রেণি পেশার মানুষের সাথে একই আঙ্গিনায় বসবাসের ফলে পরিবার ও স্বজন বঞ্চিত এ মানুষগুলো নতুন পরিজন খুঁজে পেয়েছে যা তাদের নতুন করে বাঁচার স্বপ্ন দেখায়। ফলে আত্মবিশ্বাসে বলিয়ান হয়ে তাদের মধ্যে তৈরি হয়েছে আত্মমর্যাদা ও সম্মানবোধ। আজ তারা সরকারি ও বেসরকারি দপ্তরে চাকুরি করার স্বপ্ন দেখে।

এই ধারনার উৎপত্তিঃ

হিজড়া জনগোষ্ঠী সমাজের মূলধারা হতে বিচ্ছিন্ন। সমাজে বৈষম্যমুলক আচরণের শিকার এ জনগোষ্ঠীর পারিবারিক ও আর্থসামাজিক উন্নয়ন এবং সামাজিক নিরাপত্তা নিশ্চিতকরণ সর্বোপরি তাদরেকে সামাজের মূলস্রোতধারায় এনে দেশের সার্বিক উন্নয়নে সম্পৃক্তকরণের লক্ষ্যে সরকার বিভিন্ন কর্মসূচি গ্রহণ করছে।

সরকার সামাজিক নিরাপত্তা কর্মসূচির আওতায় হিজড়া জনগোষ্ঠীর জীবনমান উন্নয়ন কার্যক্রম বাস্তবায়নের লক্ষ্যে একটি যুগোপযোগী নীতিমালা প্রণয়ন ও তা বাস্তবায়নের পদক্ষেপ গ্রহণ করেছে। ২০১৩ সালের নভেম্বরে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেয় সরকার। ২০১৯ সালের ভোটার তালিকা নিবন্ধন ফরমে লিঙ্গ নির্বাচনের ক্ষেত্রেও পুরুষ ও মহিলা এর পাশাপাশি হিজড়া অন্তর্ভুক্ত করা হয়, যা হিজড়াদের জন্য এযাবৎকালের সবচেয়ে বড় স্বীকৃতি। সরকার হিজড়াদের তৃতীয় লিঙ্গ হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ায় তাদের সাংবিধানিক অধিকার প্রতিষ্ঠিত হয়।

কিন্তু তাদের সুনির্দিষ্ট ঠিকানা না থাকায় সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর প্রায় সকল সুবিধাই ব্যর্থতায় পর্যবসিত হয়। ঠিকানা গড়তে গিয়েই বাঁধে বিপত্তি। তারা তাদের সমগোত্রের সাথে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে ভাষমান জীবন যাপনে অভ্যস্থ। এ কারণেই ‘দারিদ্য বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নঃ শেখ হাসিনা মডেল’ মাথায় রেখে সম্পুর্ণ নিজস্ব ধারণা থেকে পিছিয়ে পড়া এই জনগোষ্ঠীকে সমাজের মূলধারার অন্যান্য ধর্ম, বর্ণ ও পেশার প্রান্তিক মানুষের সাথে পাশাপাশি নতুন ঠিকানায় বসবাসের সুযোগ সৃষ্টি করে দেওয়া এবং সৌহার্দ্য, সম্প্রীতি ও সামাজিক মেলবন্ধনে আবদ্ধ করে সমাজের মূলস্রোতধারায় তাদের সম্পৃক্ত করতে জেলা প্রশাসন, বরগুনা এই উদ্যোগ গ্রহণ করেছে।

আর্থ-সামাজিক উন্নয়নে খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের প্রভাবঃ

সম্প্রীতির চেতনাকে উজ্জীবিত করে বিভিন্ন ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণি-পেশার মানুষের সাথে তৃতীয় লিঙ্গ বা হিজড়া জনগোষ্ঠীকে সমাজ ও রাষ্ট্রের আর্থ-সামাজিক কর্মকান্ডের মূলস্রোতে অন্তর্ভুক্তকরণের লক্ষ্যে ‘আশ্রয়ণ’ প্রকল্পে পুনর্বাসনের উদ্যোগ মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা অর্জনে একটি গুরুপ্তপূর্ণ পদক্ষেপ। উদ্যোগটির প্রভাবে হিজরাসহ এখানে বসবাসরত অন্যান্য জনগোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক উন্নয়নকে নিম্নরূপে পর্যালোচনা করা যেতে পারে।

মাথা গোঁজার ঠাই

এই উদ্যোগের ফলে মাথা গোঁজার ঠাই পেয়েছে ২৫ (পঁচিশ) জন তৃতীয় লিঙ্গের জনগোষ্ঠী, জীবনের লম্বা পথে যাদের জোটেনি পারিবারিক বন্ধন, জোটেনি স্নেহ-ভালবাসা; জুটেছে কেবল সামাজিক বঞ্চনা। তেমনি আছেন ১০ জন পুনর্বাসিত ভিক্ষুক, ২০ জন শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, ২৭ জন স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা এবং ৪১ জন সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষ যারা তাদের স্বপ্নের ঠিকানা পেয়েছেন এখানে। আশ্রয়ণ প্রকল্পে নিয়মিত জনগোষ্ঠীর প্রতিবেশীরূপে পুনর্বাসনের মাধ্যমে সমাজের মূলস্রোতে হিজড়াদের অন্তর্ভূক্তি নিশ্চিত হয়েছে এবং সামাজিক ও মানবিক মর্যাদা সু-প্রতিষ্ঠিত হয়েছে।

একটি সৌহার্দ্যপূর্ণ ও মানবিক মর্যাদাপূর্ণ সমাজ

এই উদ্যোগের মাধ্যমে খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পে তৃতীয় লিঙ্গের মতো সমাজে অবহেলিত, নিগৃহীত এবং পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী উঠে এসেছে সমাজের মূলস্রোতে। তাদের সাথে অন্যান্য যারা ভূমিহীন গৃহহীন রয়েছে তারা সকলে মিলেমিশে ভ্রাতৃত্বের বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে তৈরী করেছে একটি সুস্থ, সুন্দর এবং বসবাসের উপযোগী সামাজিক পরিবেশ যা তাদের মূলধারার অর্থনৈতিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করার সুযোগের দুয়ার উন্মোচন করেছে।

অর্থনৈতিক স্বাবলম্বীতা

ভাসমান ও ঠিকানাবিহীন জীবনযাপনের কারণে হিজড়াদের আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোতে অভিগম্যতা সীমিত ছিল। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসন ও সামাজিক মর্যাদা প্রতিষ্ঠা হওয়ায় আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলো থেকে কর্মসংস্থানের লক্ষ্যে তাদের ঋণ গ্রহনের সুযোগ উন্মুক্ত হয়েছে, এছাড়া তাদের জন্যে স্বল্প পরিসরে কৃষি কাজ ও

গবাদি পশু পালনের ব্যবস্থা গ্রহণের ফলে নিয়মিত আয়ের উপায় সৃষ্টি হয়েছে । পাশাপাশি জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে তাদের জন্যে আর্থিক অনুদানের ব্যবস্থাও করা হয়েছে।

নাগরিক সুবিধা

ভাসমান জনগোষ্ঠী হওয়াতে সরকারি-বেসরকারি নানারূপ অবকাঠামোগত সুবিধা প্রাপ্তিতে তাদের অন্তর্ভুক্তি সীমিত ছিল । এক্ষেত্রে এই জনগোষ্ঠী নিম্নমানের বাসস্থান, দুর্বল যোগাযোগ ব্যবস্থা, সুপেয় পানীয়জলের অভাব, অপ্রতুল ও মানহীন চিকিৎসাসেবা প্রভৃতি অবকাঠামোগত সমস্যার সাথে নিত্যদিন সংঘর্ষ হতো। আশ্রয়ণ প্রকল্পে পুনর্বাসনের ফলে এই সকল মৌলিক চাহিদার সাথে সম্পর্কিত অবকাঠামোগত অধিকার প্রতিষ্ঠা নিশ্চিত হয়েছে। এইসাথে বিভিন্ন সেবায় প্রবেশগম্যতা, বিদ্যুৎ ও নিরাপদ পানি প্রাপ্তি এবং নাগরিক মর্যাদাকেন্দ্রিক বাধা-বিপত্তির অবসান হয়েছে । ফলে তাদের সামাজিক নিরাপত্তা বেষ্টনীর আওতায় আনা সম্ভব হয়েছে।

দক্ষতার উন্নয়ন

বরগুনা জেলা প্রশাসন তাদের জন্যে সেলাই প্রশিক্ষণ আয়োজনের সাথে সেলাই মেশিনও প্রদান করেছে। ভবিষ্যতে বিউটি পার্লারের কাজ সহ অন্যান্য কর্মসংস্থানকেন্দ্রিক প্রশিক্ষণ আয়োজনের পরিকল্পনা রয়েছে। এসকল প্রশিক্ষণ দক্ষতা বৃদ্ধির পাশাপাশি তাদের কর্মসংস্থানের ব্যবস্থা করবে এবং মাদক চোরাচালান ও চাঁদাবাজিসহ সামাজিক অপরাধমূলক কর্মকান্ড থেকে অর্থনৈতিক মূলধারায় পূনর্বাসন করবে। এছাড়াও পরীক্ষামূলকভাবে ১ জন তৃতীয় লিঙ্গের

সদস্যকে জেলা প্রশাসকের কার্যালয়ে আউটসোসিং এর মাধ্যমে নিয়োগ প্রদানের কার্যক্রম চলমান রয়েছে।

সামাজিক সুবিধা লাভের অধিকার

সমাজ ও পরিবারচ্যুত হওয়ার কারণে সমাজের সম্মিলীত ব্যবহারযোগ্য সম্পদগুলোতেও তাদের অভিগম্যতা সীমিত। একটি স্থায়ী ঠিকানা প্রাপ্তি এবং সামাজিক পুনর্বাসনের মাধ্যমে বরগুনা জেলা প্রশাসনের এই উদ্যোগ তাদের আর্থ-সামাজিক উন্নয়নের পথকে মসৃণ করেছে, একইসাথে তাদের মৌলিক অধিকার লাভের পথ সুগম হয়েছ। সবাই স্ব স্ব ধর্ম পালন করছে, মানবিক মর্যাদাপূর্ণ সমাজ গঠন নিশ্চিত হয়েছে।

।

এসডিজি অর্জনে খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পঃ

মুজিববর্ষে একজন মানুষও গৃহহীন থাকবেনা--মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর এই নির্দেশনার আলোকে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে পূনর্বাসন তো করাই যায়। কিন্তু তাদেরকে নির্দিষ্ট কোন এলাকায় গৃহ নির্মাণ করে গোষ্ঠীবদ্ধভাবে পুর্ণবাসিত করলে দারিদ্য বিমোচনে অন্তর্ভুক্তিমুলক উন্নয়নঃ শেখ হাসিনা মডেল বাস্তবায়িত হয় না। তাইতো "Development .....leaving no one behind" প্রতিপাদ্যকে সামনে রেখে সমাজের পিছিয়ে পড়া বিভিন্ন ধর্ম বর্ণ ও পেশার জনগোষ্ঠীর সাথে হিজড়া জনগোষ্ঠীকে একই আঙ্গিনায় একীভূত করে একটি অন্তর্ভুক্তিমুলক সমাজ প্রতিষ্ঠার স্বপ্নে বাস্তবায়ন করা হয়েছে সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির মেলবন্ধন-খাজুরতলা আশ্রয়ণ।

জাতিসংঘের টেকসই উন্নয়ন অভীষ্ট (Sustainable Development Goals) অর্জনের পথে এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের অসামান্য ভূমিকা রয়েছে। একটি ভূমিহীন পরিবারের সামনে কেবল একটি ঘর পাওয়ার

মাধ্যমে দারিদ্রের দুষ্টচক্র থেকে বের হয়ে আসার অপার সম্ভাবনা তৈরি হচ্ছে। এর মাধ্যমে একটি ছিন্নমূল পরিবার নিরাপদ বাসস্থান, শিক্ষা, স্বাস্থ্য, নারীর ক্ষমতায়ন, নারীর অধিকারের মতো বিষয়গুলোকে অন্তর্ভূক্তির সুযোগ পাচ্ছে, ফলে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর উদ্ভাবন আশ্রয়ণ প্রকল্প অন্তর্ভূক্তিমূলক উন্নয়নের ক্ষেত্রে ইতিবাচক পরিবর্তন নিয়ে আসতে সক্ষম হয়েছে। এ আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যমে ভূমিহীন ও গৃহহীন পরিবারকে জমিসহ ঘর প্রদানের মাধ্যমে এসডিজির নিম্নোক্ত লক্ষ্যমাত্রা অর্জিত হবে:

১। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৪: ২০৩০ সালের মধ্যে সকল নারী ও পুরুষ বিশেষ করে দরিদ্র ও অরক্ষিত জনগোষ্ঠীর অনুকূলে অর্থনৈতিক সম্পদ ও মৌলিক সেবা সুবিধা, জমি ও অপরাপর সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণের কথা বলা হয়েছে। একই সাথে ক্ষুদ্রঋণসহ অর্থিক সেবাপ্রাপ্তির ক্ষেত্রে সমঅধিকার প্রতিষ্ঠা করা হয়েছে।

২। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১.৫: দারিদ্র্য ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর অভিঘাত সহনশীলতা বিনির্মাণ এবং জলবায়ু পরিবর্তনজনিত আক্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্থদের ঝুঁকি কমিয়ে আনা।

৩। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ২.৩: ভূমি এবং অন্যান্য উৎপদনশীল সম্পদ ও উপকরণে নিরাপদ ও সমান সুযোগ নিশ্চিত করার মাধ্যমে ক্ষুদ্র পরিসরে খাদ্য উৎপাদনকারী বিশেষ করে নারী, আদিবাসী জনগোষ্ঠী, পারিবারিক কৃষক, পশুপালনকারী ও অন্যদের আয় ও কৃষিজ উৎপাদনশীলতা দ্বিগুণ করা।

৪। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৩: সকল বয়সী মানুষের জন্য সুস্বাস্থ্য ও কল্যাণ নিশ্চিতকরণ।

৫। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৫.ক: অর্থনৈতিক সম্পদ এবং ভূমিসহ সকল প্রকার সম্পত্তির মালিকানা ও নিয়ন্ত্রণ, আর্থিক সেবা, উত্তরাধিকার এবং প্রাকৃতিক সম্পদে নারীর সমঅধিকার নিশ্চিতে প্রয়োজনীয় সংস্কার কাজ সম্পাদন।

৬। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ৬.২: পর্যাপ্ত ও সমতাভিত্তিক স্যানিটেশন স্বাস্থ্যবিধিসম্মত জীবনরীতির অভিগম্যতা নিশ্চিত করা এবং নারী ও বালিকাসহ অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীর চাহিদার প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রেখে খোলা জায়গায় মলত্যাগের অবসান ঘটানো।

৭। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১০.২: বয়স, লিঙ্গ, প্রতিবন্ধিতা, জাতিসত্তা, নৃ-তাত্ত্বিক পরিচয়, উৎস (জন্মস্থান), ধর্ম, অর্থনৈতিক বা অন্যান্য অবস্থা নির্বিশেষে সকলের ক্ষমতায়ন এবং এদের সামাজিক অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক অন্তর্ভূক্তির প্রবর্তন।

৮। এসডিজি লক্ষ্যমাত্রা ১১.৫: দরিদ্র ও অরক্ষিত পরিস্থিতিতে বসবাসকারী জনগোষ্ঠীকে রক্ষার ওপর বিশেষ গুরুত্ব প্রদান করে পানি সম্পৃক্ত সুযোগসহ অন্যান্য দুর্যোগে ক্ষতিগ্রস্থ ও মৃতের সংখ্যা উল্লেখযোগ্য পরিমাণে হ্রাস করা।

খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্প: সৌভাগ্যের হাতছানি

- এই আশ্রয়ণ প্রকল্পের মাধ্যম স্বামী-স্ত্রী যৌথ মালিকানায় বিনামূল্যে বিদ্যুৎ সংযোগ ও সুপেয় পানির সুবিধাসহ ২ শতক জমি ও একটি সেমিপাকা ঘরের মালিক হচ্ছেন। একই সাথে তাঁদের স্বাবলম্বী করতে ক্ষুদ্রঋণের সুবিধা প্রদান করা হচ্ছে।
- উপকারভোগীদের জন্য সুপেয় পানি, আধুনিক স্যানিটেশন ও পরিচ্ছন্নতা নিশ্চিত করাসহ কমিউনিটি ক্লিনিকের মাধ্যমে স্বাস্থ্যসেবা নিশ্চিত করা হচ্ছে।
- অনগ্রসর ও ছিন্নমূল পুনর্বাসিত পরিবারসমূহ বসতভিটার আঙিনায় সবজি চাষ, পশুপালনসহ প্রকল্পের সংলগ্ন পুকুরে মৎস্য চাষ করেছে। তাদের উৎপাদনমুখী কাজের জন্য বিভিন্ন প্রশিক্ষণ ও ক্ষুদ্রঋণ প্রদান করা হচ্ছে।
- স্বামী-স্ত্রীর যৌথ নামে জমি ও ঘরের মালিকানা দেওয়া হচ্ছে এবং প্রচলিত আইনি কাঠামোর আওতায় এসব জমি ও ঘরে তাঁদের উত্তরাধিকারীদের স্বত্ব বহাল থাকছে।
- প্রত্যেকে একক গৃহের সাথে আধুনিক স্বাস্থ্যসম্মত স্যানিটেশন ও সুপেয় পানির ব্যবস্থা করা হচ্ছে ফলে, নারী ও বালিকাসহ সকলের জন্য যথোপযুক্ত স্যানিটেশন নিশ্চিত হচ্ছে।
- সমাজের পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠী হিজড়া (৩য় লিঙ্গ), পুনর্বাসিত ভিক্ষুক, শারীরিকভাবে অক্ষম ব্যক্তি, স্বামী পরিত্যাক্তা মহিলা, সনাতন ধর্মাবলম্বী মানুষসহ সকল ভূমিহীন-গৃহহীন মানুষকে ২ শতক জমির মালিকানা প্রদান করে তাদের সামজিক মানমর্যাদা উন্নত করা হচ্ছে এবং তাদের উন্নয়নের মূল স্রোতে নিয়ে আসা হচ্ছে।
- প্রাকৃতিক দুর্যোগ থেকে যেন সেমিপাকা দুর্যোগ সহনীয় ঘর রক্ষা পায় সেজন্য বন্যা বিপৎসীমার উপরে তুলনামূলক উঁচু স্থানে প্রতিটি গৃহনির্মাণ

করা হচ্ছে বিধায় বন্যাসহ বিভিন্ন দুর্যোগে জানমালের সুরক্ষা নিশ্চিত করা সম্ভব হচ্ছে।

এসডিজি বাস্তবায়ন প্রক্রিয়ার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ও সমন্বিত নীতি কাঠামো প্রণয়নে বাংলাদেশের অগ্রগতির প্রধান কারণ হচ্ছে অন্তর্ভূক্তিমূলক কর্মসূচি প্রণয়ন ও বাস্তবায়ন। একই সাথে এসডিজিকে সমান্বিত করা হয়েছে অষ্টম পঞ্চমবার্ষিক পরিকল্পনার (২০২১-২০২৫) সাথে যা উন্নয়ন এজেন্ডা বাস্তবায়নে বৃহৎ অবকাঠামো উন্নয়নের সাথে সমাজের দরিদ্র, সুবিধাবঞ্চিত ও পিছিয়ে পড়া জনগোষ্ঠীকে একীভূত করেছে। মুজিববর্ষে বিশেষ উদ্যোগ সমাজের ছিন্নমূল মানুষকে জমি ও গৃহ প্রদানের মাধ্যমে মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা এ অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করলেন।

ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষের মূল ধারায় ফেরানোর গল্পঃ

মাথার উপরে একই আকাশ, একই আলো অন্ধকার ঘিরে থাকা কিংবা একই চাঁদ ও সূর্য সকলের জন্য হলেও ভাগ্য বিড়ম্বিত কিছু মানুষ কখনই মূল ধারায় টিকে থাকতে পারে না বা তাদের থাকা হয় না। সেই মানুষগুলো হয়তো সাহায্য নির্ভর জীবন যাপন করতে করতে একসময় স্বাবলম্বি হতে ভুলে যায়। বিভিন্ন সময়ে তাদের জন্য নেওয়া মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর নানা ধরনের সরকারী উদ্যোগ গ্রহন করে তারা স্বপ্ন দেখা শুরু করেছে স্থায়ী আবাস পাবার। তাদের সেই স্বপ্ন এখন হাতের মুঠোয়।

যাদের নিত্য বসবাস ছিল ঝড়, বন্যা ভাঙ্গন কিংবা খরা ও বৃষ্টির সঙ্গে তাদের মাথার উপর আজকে একটা ছাদ আছে, আছে মাথা গোঁজার ঠাই। আর সেই মানুষগুলো আজ উঠোনে বসে নতুন স্বপ্ন বুনে। ঘরের কোনায় পালন করে হাঁস মুরগি কিংবা ছাগল। ঘরের পেছেনে তাদের রোপন করা শাক সবজির ডগা যখন তরতর করে বড় হয় তখন বড় হতে তাকে তাদের বেঁচে থাকার বিশ্বাস। আর ছিন্নমূল এই মানুষগুলোর ছন্নছাড়া জীবনে স্বপ্নের সঞ্চার করার একমাত্র অবদান বঙ্গবন্ধু কন্যা জননেত্রী শেখ হাসিনার।

সরকারের এতসব উন্নয়ন কর্মকান্ডের মধ্যে খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পটি একটু ভিন্নভাবে দেশের মানুষের নজর কেড়েছে, গণমাধ্যমে জুগিয়েছে আলোচনার রসদ, প্রশংসা কুড়িয়েছে স্থানরীয়দেরও। কারণ একই মহল্লায় বা একটি প্রকল্পের আওতায় নানা ধর্মের, বর্ণের, গোত্রের এমনকি তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের সহাবস্থান রয়েছে এবং একদম কোনো ধরনের দ্বীধা ছাড়াই তারা প্রতিবেশীদের সঙ্গে ভাব বিনিময়, প্রয়োজনীয় যোগাযোগ, লেনদেনসহ যাবতীয় কাজ করছে। সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতির এ যেন এক অনন্য নজির।

তাদেরই একজন চায়না আক্তার। বয়স ৬৩ বছর। ১৯৬০ সালে বরগুনার পাথরঘাটা উপজেলায় জন্ম। নাম ছিলো ... ৬ বছর বয়সেই বাবা মাকে হারান। ঠাই হয় কক্সবাজারে বড় বোন দুলাইভাই এর বাসায়। ছোটবেলা থেকেই তার ছেলেদের চাইতে মেয়েদের সাথে মিশতে ভালো লাগতো। এনিয়ে ছেলে বন্ধুদের কাছে খোটাও শুনতে হতো। হঠাৎ করেই একদিন সে বুঝতে পারে তার শরীরেও পরিবর্তন আসছে। হাটা চলারও পরিবর্তন হতে থাকে। পাড়া প্রতিবেশীরা তাকে টিটকারি মারতো।

চায়নার ভাষায় “পেরথমে বোজদাম না। যেকালে এট্টো বোঝদে হেখলাম হেইকালে খালি কানতাম। বাপ মা নাই। দুলাভাইর গরে ব্যাবাক কাম হরা লাগদে। দুলাভাই মোরে হাফ লেডিস বোলাইতে। কিছু ওইলেই মোরে দোষ

দেতে। কথায় কথায় মারতে। বুইনেরেও অত্যাচার হরতে। গাডে পোতে আড়ালে ব্যাবাক্কে চাইয়া থাকতে, খারাপ কথা কইতে। পোলারা মোরে খেলায় লইতে না। মাইয়্যাগো বাপ মায়রা মোর লগে মেশতে মানা হরতে। বুইনে মরে গুইজ্জা থুইতে। বায়রায় যাইতে দেতেনা। যুদ্ধের কালে দুলাভাই গরে গোনে বাইর হইররা দ্যায়। হেকালে মোর বয়েস ১০ কি ১২ অইবে। কোম্মে জামু, কি খামু কিচ্ছু জানিনা। আগে যেকালে আট-বাজারে যাইতাম, হেইকালে হিজড়ারা মোর লগে কথা কইতে চাইতে। বারিদ্দা বাইর অইয়্যা হ্যাগো আস্তানায় যাই। হ্যাগো লগে থাহা শুরু হরি। গুরু মা দলবাইন্দা টাহা তোলতে পাডাইয়্যা দেতে। এলাকার মানে খামার দেতে। মোন্দো কথা কইতে। ব্যাবাক্কে মোওে চেনতে। কয়দিন পর হ্যারা মোরে গুরু মার দারে পাডাইয়্যা দেয়। হেইকালে মুই উকিলপট্টি আই। বয়েস কম আল্লে দেইক্কা পেরথমে কোন কাম দেতে না। থালা-বাডি মাজা, জামা-কাফুর দোয়া, বাজার হরা ও গর পরিষ্কারের কাম হরতাম। গুরু মা নাচ-গান, হাততালি দেওয়া, কড়া লিবিশটিক লাগাইন্না, ডোল বাজাইন্না শিহাইতে। মোর নাম দেয় চায়না আক্তার। এই রহম দীক্ষা লইয়্যা হিজড়াগিরিতে নামি।”

শুরু হয় চায়নার জীবনের আরেক অধ্যায়। চায়না যখন রাজপথে হেঁটে হেঁটে টাকা সংগ্রহ করতেন, তখন অনেকেই তাকে মারতে চাইতো, টাকা ছিনিয়ে নিতে চাইতো, খারাপ প্রস্তাব দিতো। পানি খেতে চাইলে দোকানি গ্লাস ধরতে দিতেন না, হেলপার বাসে উঠতে দিতেন না। নতুন হওয়ায় তেমন একটা টাকাও সংগ্রহ করতে পারতেন না। তাই দিন শেষে ডেরায় গিয়ে গুরু মা’র কটু কথা শুনতে হতো। এভাবেই চলতে লাগলো তার জীবন। একসময় চায়না উকিলপট্টি থেকে চলে আসেন থানাপাড়ায়। বয়স বাড়তে থাকে। সেই সাথে বাড়তে থাকে অবহেলা আর নির্যাতনের মাত্রা। যৌন হয়রানিতো ছিলো নিত্যদিনের ঘটনা। এমনকি যেখানে থাকতো সেখানেও রাতে ছেলেরা এসে বিরক্ত করতো। ধর্ষণের হুমকি দিতো।

চায়না বলেন, “পেরতেক রাইতে চোক মোছতে মোছতে গুমাইতাম। আরেক কামে যাইতে চাইছি। সংসার হরতে চাইছি কিন্তু পারিনাই। হিজড়াগিরি ছাড়া আর কোন পোথ পাই নাই।”

চায়নার জীবনের পরতে পরতে কষ্টের ছাপ। পরিবার, সমাজ তাকে স্বাভাবিক জীবনে ফিরতে দেয়নি। আঘাত পেতে পেতে এখন কোন আঘাতই তাকে আর কষ্ট দেয় না। চায়না যখন তার জীবনে ঘটে যাওয়া বাস্তবতার গল্প বলছিলেন, তখন তার দু’চোখ বেয়ে অশ্রু ঝরছিল।

বলছিলেন, “এই জীবন একছের কষ্টের। এইডা কইয়্যা বুঝান যাইবেনা। পঙ্গু অইয়্যা জন্মাইলেও আইজ একটা সংসার থাকতে, সন্তান থাকতে। জীবনে কোনদিন সুখ পাইলাম না।”

যে সুখের জন্য চায়না জীবনভর পথে ঘাটে ঘুরেছেন। সেই সুখ তিনি পেয়েছেন খাজুরতলার এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে এসে। স্নেহ বঞ্চিত চায়না এখানে এসে পেয়েছেন স্নেহ। পরিবার হারিয়ে পেয়েছেন আরেক পরিবার।

চোখ মুছে চায়না আবার বলতে লাগলেন, “এহোন আর শরীরডা চলেনা। আগের নাহান বাইর অইতে পারিনা। দোয়া হরতাম য্যানো শ্যাষ বয়সে আইয়া আর লাঞ্ছনা না অয়। হেই দোয়া মোর কবুল ওইছে। আশ্রয়ণে মুই নিজের ঘর পাইছি। মাতার উপরে ছাদ ওইছে। এইহানে কোন কষ্ট নাই। সবাই খোজ খবর লয়। আগে যেকালে বস্তিতে থাকতাম হেইকালেই আলাদা থাহা লাগদে। কেউ কথা কইতে না। কিন্তু এইনে ব্যাবাক্কের লগে থাহি। ব্যাবাক্কে কথা কয়। হিন্দু মুসলমান হিজড়া কোন ভেদাভেদ নাই। একছের সুখে আছি। প্রধানমন্ত্রীকে ধন্যবাদ, ডিসি স্যাররেও ধন্যবাদ। মুইতো ভাবতেই পারিনাই যে মোর নামে কোনো জমির দলিল ওইতে পারে। যেকালে দলিলে স্বাক্ষর হরছালাম, হেকালে চোহে পানি আইয়্যা পড়ছেলে।

শুধু চায়না আক্তার-ই নয়, তারমতো প্রায় ২৫ জন তৃতীয় লিঙ্গের মানুষের জায়গা দেয়া হয়েছে খাজুরতলার এই আশ্রয়ণ প্রকল্পে। হাটে-বাজারে, পথে-ঘাটে, পার্কে, সিগন্যালে টাকা সংগ্রহ করা এদের প্রত্যেকের জীবনের গল্প একই। পরিবারের একজন হিজড়া হয়ে জন্ম গ্রহণ করায় কিংবা মেয়েলি স্বভাবের জন্য বাবা মায়েরা তাদের থেকে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছে। কারো পরিবার বের করে দিয়েছে কেউবা সমাজের কারণে বেরিয়ে আসতে বাধ্য হয়েছে। আর খাজুরতলা তাদেও দিয়েছে আশ্রয়। শুধু তাই নয় সমাজের বাইরে থাকা এই মানুষ গুলো মুলস্রোতে এনে দিয়েছে। তারা এখন এই সমাজেরই একজন।

৩০ বছর বয়সী শাহিনুর বলেন, "মোগো কেউ ঘর ভাড়া দেতে না। দেলেও বেশি ভাড়া দেওয়া লাগদে। ভয়ে ভয়ে থাকতাম। কোনদিন আবার বাইর হইররা দেয়। কোন ঠিকানা আছেলে না। যাযাবরের নাহান আইজ এইহানে কাইল ওইহানে যাওয়া লাগদে। দৌড়ের উপরে আছালাম। কেউ ভালোপাইতে না। ব্যাবাক্কে ভয় পাইতে। ভালভাবে কথা কইতেনা। মায় মইরা গ্যাছে। বাপে খবর লয়না। ফোন দেলে ভাই ফোন ধরেনা। ১০ বচ্ছর আগে বাড়ি ছাড়ছি। বাড়ি গ্যালে ভাইরা কইতে তুঁই আইছো কির লইজ্ঞা? মোগো মান সম্মান যায়। ঘরে ঢোকতে দেতেনা। মনে হইতে এই জীবন রাখমুনা। এই জীবন দিয়া কি অইবে। কয়দিন আগে অসুখ হইল্লে। এইহানের মানেরাই ব্যাবাক হরছে। ভাত রাইন্দা দিয়া গেছে। ঔষাধ খাওয়াইছে। এরাই মোর বাপ মা। এগোরেই মুই বাপ মা বোলাই। মনে অয় যেন পরিবারেরে মধ্যে আছি। এহন আর কষ্ট লাগেনা। একটা স্থায়ী ঠিকানা ওইছে। আর কোনোহানে যাওয়া লাগবেনা"। শাহিনুর যোগ করেন, "মোর লাইজ্ঞা ভাই-বুইনের বিয়া হইতেনা। ব্যাবাক্কে কইতে ওই ঘরে হিজড়া আছে। বিয়া দেলে মাইয়্যা পোলাও হিজড়া ওইবে। আব্বায় রাস্তাইদ্দা আইট্টা গেলে মাইনষ্যে কইতে, ওইযে হিজড়ার বাপ আইতে আছে। রাস্তাইদ্দা মোরে দ্যাখলে কইতে, ছাইয়া আইতেয়াছে, ওই যে আইতেয়াছে। বাসে ওটতে দেতেনা। কোনকিছুর লাইজ্ঞা লাইনে খাড়াইতে দেতেনা। দোহানে কিছু কেনতে

গেলে দোহানি ধরতে দেতেনা। পদে পদে অপমান। এইহানে কেউ হিজড়া কইয়্যা বোলায় না। নাম ধইররা বোলায়। মোর মায় (৫০ বছর বয়সী মুসলিম নারী) চুল আচড়াইয়া দ্যায়। ভালোপায়। এক দোহানে গিয়া বাজার হরি। ব্যাবাক্কে একলগে মিল্লামিশ্যা থাহি। মোগো একছের ভালো লাগে। যাযাবর ওইতে আশ্রয় ওইছে। স্থায়ী ঠিকানা ওইছে। আগে মানষের ধারে আইতে চাইলে চিল্লাইতাম, পলাইতাম, ডর হরতে। এহন আর ডর হরেনা। এরার সবাই আপন ওইয়া গ্যাছে। অসুখ ওইলে দ্যাখতে যাই। রাইন্দা খাওয়াই। ডিসি স্যার মোগো ছাগল দেছে। ছাগল পালি। সময় কাইট্টা যায়।"

জীবনের প্রতি ঘৃণা জন্মানো এই মানুষ গুলো এখানে এসে নতুন করে বাঁচার রসদ পেয়েছে। আর পাঁচটা সুস্থ সবল মানুষের সাথে মিশতে পারছে।

খাজুরতলার ৪১ জন সনাতম ধর্মাবলম্বীর একজন রমেস মিস্ত্রী, বয়স ৫৫ বছর। পিরোজপুর জেলার মঠবাড়িয়া থানায় জন্ম। জন্মের ১৩ দিনের মাথায় মা মারা যান। মানুষ হন ফুপুর কাছেই। মুক্তিযুদ্ধের সময় পাকবাহিনী তাদের বাড়ি পুড়িয়ে দেয়। সপরিবারে আশ্রয় নেন ভারতে। যুদ্ধ শেষে ফিরে আসেন দেশে। কিন্তু তার বাবাকে আর খুঁজে পাননি। সেই সময়ের স্মৃতি আবছা মনে আছে তার। বললেন, "যুদ্ধেরকাল মোর বয়েস তখন ৬ কি ৭ বচ্ছর। একদিন দেহি মোগো বাড়ি আগুন। ব্যাবাক্কে দৌড়াদৌড়ি হরতেয়াছে। ফুফু মোরে কোলে লইয়া বাইর হইয়া গ্যাছে। লগে ফুফাতো বাইরাও আছেলে। চাইরদিহে খালি ছোডাছোডি, হুলুস্থুল।"

যুদ্ধ শেষ হলে তারা ফেরত আসেন দেশে। এবার শুরু হয় জীবন যুদ্ধ। ফুপা হঠাৎ মারা যান। শোকে ফুপু প্যারালাইসড হয়ে পরেন। সেই সময় তার ফুপাতো ভাইদের জমি জায়গা নিয়ে বিরোধ লাগে। ভয়ে রমেস পালিয়ে যান। তখন তার বয়স ১২ বছর। আশ্রয় নেন বরগুনায় তার বাবার পরিচিত এক বন্ধুর বাড়িতে। সেখানে জীবন শুরু করেন নতুনভাবে। বাবার বন্ধুর সবজির ব্যবসায় সাহায্য

করতেন। তার কাজে খুশী হয়ে বাবার বন্ধু নিজের মেয়ের সাথে বিয়ে দেন রমেসের। তিনি তখন শ্বশুর বাড়িতেই থাকতেন। প্রথম বাচ্চা জন্ম দেবার সময় তার স্ত্রীর জরায়ুতে সমস্যা দেখা দেয়। স্ত্রীর চিকিৎসার জন্য টাকা যোগার করতে পারেননি রমেস। এরইমধ্যে তার শ্বশুরও মারা যান। শ্বশুরের চার সন্তান এক হয়ে রমেসকে আর তার স্ত্রীকে তাদের বাড়ি থেকে বের করে দেন। তারা একটা ভাড়া বাড়িতে ওঠে। জমানো কিছু টাকা দিয়ে রমেস রাস্তায় রাস্তায় সবজি বিক্রি করা শুরু করে। একদিকে অসুস্থ স্ত্রী, ছোট বাচ্চা আর বাসা ভাড়ার চাপে অস্থির হয়ে যান রমেস। সেই পরিস্থিতি বলতে বলতে কেঁদে ফেলেন রমেস, "মনডায় কয় মোর হুবুর অভিশাব লাগযে। যেই হুবু মোরে বড় হরছে হ্যারে থুইয়্যা মুই পলাইয়্যা আইছি। কিন্তু মোর তো আর কিচ্ছু হরার আল্লে না। মুই হেকালে একছের ছোডো আল্লাম। পরে হুনি হে মইররা গ্যাছে। মোর জীবনডায় কি যে কষ্ট গ্যাছে এককালে। মনে অইতে পাগল অইয়া যামু। এই রহম অবস্থায় মোর এক পরিচিত মোরে কইলে যে সরকার বলে ঘর দেতাছে ফরম পূরণ হইররা থুইতে। হেইরপর মুই ফরম পূরন হইররা আই। হেইরপর তো মোগো নামে ঘর আইলো। মুই ভাড়া বাড়ি থুইয়্যা এইহানে ওডলাম। মোর যে কি খুশি লাগদে আছেলে। একটা জাগা আল্লেনা মোর। এখন জাগা অইছে। মুই বাবা লোকনাথের ভক্ত। প্রধানমন্ত্রীর লইগ্গা মুই আশীর্বাদ হরি। হে য্যানো হাজার বচ্ছর বাইচ্চা থাহে। ডিসি স্যারওে ধন্যবাদ দেই। মোর প্রার্থনা পূরণ অইছে। মুই এহন নিজের ঘরে মরতে পারমু। আগে যা ইনকাম হরতাম হ্যা বাসা ভাড়া দ্যেতেই যাইতে। পেরতেক মাসে ২ আজার টাহা হইররা দেওয়া লাগদে। এহন হেই টাহাডা জমাই আর ঘরের পাশে নিজেই তরকারির গাছ লাগাইছি। আবার এইহানেই অনেকে মোর দাইরদ্যা তরকারি কেনে। মোর ব্যাচা বিক্রিও আগের চাইতে ভালো। এহন মোরা ডাইল ভাত খাইয়্যা শান্তিতে আছি। আর যে টাহাডা জমাইতে হেইডাইদ্দা বউর চিকিৎসা হরাই। মাইয়্যারে বিয়া দিছি"। একজন হিন্দু হিসেবে এতোজন মুসলমানদের সাথে বাস করতে গিয়ে কোন সমস্যা হয় কি না?

জানতে চাইলে তিনি বলেন, "মুই হারাডাজীবন পলাইয়্যা ব্যারাইছি। কষ্ট হরছি। কেউ মোরে সাহায্য হরেনাই। মুই কোনোদিন চিন্তাও হরিনাই এতো মধুর সম্পর্ক মোর কেউর লগে অইবে। হ্যাও আবার মুসলমানগো লগে। এইহানে মুই ১ বচ্ছর ধইররা আছি। গোবিন্দর আশীর্বাদে মুই খুব সুখে আছি।

এখানের প্রতিটা মানুষের জীবনই যেন ভাগ্যের নির্মম পরিহাসের গল্প। ৩৫ বছর বয়সী জাহেদা বেগমও দেখেছেন জীবনের চরম উত্থান পতন। তার বিয়ে হয়েছিলো কুয়াকাটার কলাপাড়ায়। স্বামী সহ একটা রাইস মিলে কাজ করতেন। দুই সন্তান নিয়ে মোটামুটি কেটে যাচ্ছিলো তাদের জীবন। বর্ষাকালে স্বামী জেলেদের সাথে সাগরে মাছ ধরতে যেতো। সারারাত মাছ ধরে সকালে হাটে বেঁচে বাড়িতে ফিরতো। কিছু বাড়তি আয়ও হতো। ২০০৭ সালে বর্ষার কোন এক রাতে তার স্বামী মাছ ধরতে গিয়ে আর ফিরলোনা। স্বামীর সাথীরা সবাই ফিরেছে। কেউ খোঁজও দিতে পারছেনা। সকাল গড়িয়ে গেলো। অজানা শংকায় কেঁপে উঠলো জাহেদার বুক। ৬ মাসের সন্তানকে কোলে নিয়ে ছুটলো সাগর তীরে। শুরু হলো অপেক্ষা। দূর থেকে জেলেদের নৌকা দেখলেই মনে হতো ওইতো তার স্বামী ফিরলো বোধহয়। কিন্তু না একটু স্পষ্ট হতে বুঝতো সে নয়। কাঁদতে কাঁদতে জাহেদা বলে, "পেরতেক দিন বেইন্নাইল অইতে হাউজ্জাহাল পোর্যন্ত বইয়া থাকতাম। হে আর আইতে না। পোলাপান দুইডা বাহের কথা জিগাইতে। মুই কিচ্ছু কইতে পারতাম না। হ্যার লগের মানুরা আইলে জিগাই হ্যারে দ্যাখছে কি না। ব্যাবাক্কে কয় দ্যাহে নাই। হেইর পরে বোজলাম হে আর আইবেনা। পানিতে ভাইস্যা গ্যাছে। হ্যার লগের আরও দুইজনের খবর পাওয়া যায়নাই। শুরু হইলে মোর জীবনের কষ্ট। কামে মন বইতে না। হারাদিন খালি কানতাম। পরের বাড়ির মানে খালি খামার দেতে। অপয়া কইতে। মোর ভরন পোষণ দেতে পারবেনা কইতে। এলাকার যুয়ান ব্যাডাও মোরে বিরক্ত হরতে। খারাপ প্রস্তাব দেতে। ৩ মাসের মাতায় পোলাপান দুই ডারে লইয়া বাহের বাড়ি আইয়া পড়লাম। বাহে কোনরহমে একটা থাহার জায়গা হইররা দেয়। মুই মানের

বাড়ি বাড়ি কাম হরতাম। কয়ডা চাউল আর মাসে ৪০০/৫০০ টাহা পাইতাম। দুইটা পোলাপান লইয়া চলতেনা। ওগো ঠিকমতো খাওয়াইতে পারতাম না। বাপ, ভাই তো সবসময় সাহায্য করতে পারতোনা। পরে একটা হোডেলে রান্দার কাম পাইলাম। তিন বেলা খাওয়াইতে আর মাসে ৩ হাজার টাহা দেতে। আগের চাইতে অবস্থা একটু ভালো হইলো। এইরমধ্যে বাপ মাইরর গেলে। ভাইরা বাড়িদ্দা বাইর হইররা দেলে। ম্যালা কষ্টে একটা ঘর ভাড়া লইয়া থাকতে লাগলাম। টাহার অবাবে বড় পোলাডারে পড়াইতে পারলাম না। কামে লাগাইয়া দেলাম। ছোডডারে পড়াইতাম।" এমন অবস্থায় জাহেদা গ্রাম পুলিশের মাধ্যমে জানতে পারে যে সরকার গৃহহীনদের ঘর দিচ্ছে। সে ইউনিয়ন পরিষদে গিয়ে তার নাম, ছবি আর ভোটার আইডি কার্ড দিয়ে আসে। তার প্রায় বছর খানেক পরে জাহেদাকে খোঁজ করা হয়। সে খুশীতে ইউনিয়ন পরিষদে চলে যায়। জাহেদা বলছিলো, "মোর যে কি খুশী লাগদে আছেলে। খুশীতে কানতে আছিলাম। ইউএনও স্যার মোরে জিগাইলে মুই ঘরে থাকমু কি না? মুই কইলাম মরার আগ পর্যন্ত থাকমু স্যার। এইর পর তো ২ বচ্ছর অইলো এইহানে উডছি। এইহানে ওডার পর বড় পোলাডারে বিয়া দিছি। হে নিজের কামাই নিজে হইররা খায়। ছোডো পোলাডারও ব্যবস্থা এই প্রকল্পেই অইছে। হে রাজমিস্ত্রীগো লগে কাম হরতে। মাসে ৬ হাজার টাহা পায়। আবার ল্যাহাপড়াও হরে। কেলাস নাইনে পড়ে। মুই আশ্রয়ণের পাশেই আরেকটা হোডেলে কাম হরি। হেইহানে এহন ৯ হাজার টাহা পাই। মোর ঘর ভাড়ার টাহা দেওয়া লাগেনা। টাকা জোমাইতে পারি। নিজের এউক্কা গর অইছে মোর এর চাইতে আনন্দের আর কিচ্ছু নাই। এইহানে মোরা ব্যাবাক্কে এউক্কা পরিবার। হিন্দু, মোসোলমান, হিজড়া কইয়া কিচ্ছু নাই। মোগো আজানের কালে হিন্দুরা পূজা বন্ধ রাহে। ওগো কোন সমস্যা অইলে মোরা যাই। মোগো কিচ্ছু হইলে ওরা আয়।

পঞ্চাশোর্ধ হাসিনা বেগমের জীবনের গল্পতো আরও কঠিন। বরগুনার তালতলিতে বাস করতেন। স্বামী ছিলেন দিনমজুর কিন্তু সংসারের ব্যাপারে উদাসীন। খরচ

দিতে চাইতেন না। তাই হাসিনা নিজেই পরিচিত এক রাজমিস্ত্রীর দলের সাথে কাজ শুরু করেন। শুরুতে যোগানদাতা হিসেবে কাজ করলেও পরে তিনি বিভিন্ন মেশিনের ব্যবহারও শিখে ফেলেন। দলের সাথে বিভিন্ন জায়গায় ঘুরে ঘুরে কাজ করতেন। দৈনিক ৩০০ টাকা আর এক বেলা খাবার পেতেন। তার দুই ছেলে আর এক মেয়ে ছিলো। বিয়ের ১০ বছরের মাথায় তার স্বামী আরেকটা বিয়ে করে চলে যায়। তখন তার বড় ছেলে ৭ বছর, ছোট ছেলে ৪ বছর আর মেয়ে গর্ভে। স্বামী চলে যাবার পর শ্বাশুড়িসহ অনেক খোঁজাখুঁজি করেছেন। কিন্তু পাননি। শ্বাশুড়ি হাসিনাকে ভীষণ আদর করতেন। তাই তাকে নিজের কাছেই রেখে দিয়েছিলেন। হাসিনাও শ্বাশুড়ির কাছে থেকেই মিস্ত্রীর কাজ করতেন। কিন্তু শ্বাশুড়ি মারা যাবার পরে শ্বশুড় বাড়ির লোকেরা তাকে বের করে দেয়। পরে হাসিনা তার তিন সন্তানসহ বাপের বাড়ি চলে আসে। তার কাজ তখনও ভালোই চলছিলো। একদিন এক রাস্তার ঢালাইয়ের কাজে তাদের নিয়ে যাওয়া হচ্ছিলো ট্রাকে করে। ট্রাকে নারী পুরুষ মিলে বিশ জনের মতো শ্রমিক ছিলো। সাথে ছিলো ঢালাইয়ের ভারী মেশিন। হঠাৎ বিপরীত দিক থেকে আসা আরেকটি ট্রাকের সাথে হাসিনাদের ট্রাকের মুখোমুখি সংঘর্ষ ঘটে। হাসিনাদের ট্রাক টা উল্টে যায়। ট্রাকের ভারী মেশিনে চাপা পরে দুজন ঘটনাস্থলেই মারা যায়। আর হাসিনা সহ আরও ৫ জন গুরুতর আঘাত পায়। পরে তাদের বরিশাল হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়। সেই ভয়ানক ঘটনার বর্ণণা হাসিনা এভাবে দিচ্ছিলেন, “মোগো ট্রাকডা যেকালে উইল্ডা গেলে হেকালে মোরা ব্যাবাক্কে রাস্তার পাশে পইররা গেছি। নিজের চোহে দেখছি ঢালাইয়ের মেশিনডা ক্যামনে ছিট্টা আইয়া দুইজনের উপরে পল্লে। হ্যারা চিল্লাইন্নার সময়ডাও পায়নাই। হের আগেই মইররা গ্যাছে। মুই পায় ব্যতা পাইল্লাম বেশি। হের লইগ্গা উইট্যা খাড়াইতে পারিনাই। মোগো পেরথম বরগুনা হাসপাতালে পরে বরিশাল হাসপাতালে লইয়া যায়। মোর পাও একমাস ব্যান্ডেজ কইররা দেয়। পরে হুনি পায়ের জয়েন্ট আলেদা অইয়া গ্যাছে। ম্যালা টাহা লাগবে অপারেশন করাইতে।

কিন্তু হ্যারা মোরে আর কোন টাহা দেয় নাই। হেই ভাঙ্গা পাও লইয়াই বাড়ি আইলাম। জীবনডা আন্দার অইয়া গ্যলে। কি হরমু। কি খামু। হেড মিস্ত্রীর দারে গেল্লাম। সে কয় হেরেই টাহা দেয়নাই আর মোগো কি দেবে। অকেজো অইয়া পইররা রইলাম। আগে যে টাহা ইনকাম হরতাম হ্যা দিয়া কোনরহম চলতে পারতাম। কিন্তু হেকালে তো আর লড়তেই পারতাম না। এক বচ্ছর হুইয়া বইয়া কাডান লাগজে। হেকালে বড় পোলাডা রিক্সা চালাইতে। ওই টাহা দিয়া সংসার চলছে।" হাসিনার ছেলেরা বড় হতে থাকে। কাজ করে। হাসিনা ভাবতো এই বুঝি তার দু:খের অবসান হবে। কিন্তু না বড় ছেলে বিয়ে করে বউ সহ ঢাকায় চলে যায়। মায়ের খোঁজ রাখেনা। আর ছোট ছেলেও যা আয় করতো তা দিয়ে নিজেই হিমশিত খায়। মেয়েটাকে নিয়ে অসহায় হাসিনা মানুষের দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা কওে বেড়াতো। হাসিনার ভাষায়, "হেই কষ্ট কইয়া বুজান যাইবেনা। যেই পোলাগো মানুষ করতে মোর পাওডা গ্যালে হেই পোলারা বিয়া হইররা জুদা অইয়া গ্যালে। বড় পোলা তো খরবরই রাকলেনা। আর ছোডডার অসুক। হের নিজেরই সংসার চলেনা। মানের দারে খয়রাত কইররা চলতাম।" এরই মধ্যে হাসিনা জানতে পারে তার নামে সরকারি ঘর আসছে। খুশীতে ছুটে যায় ইউনিয়ন পরিষদে। পেয়ে যায় স্বপ্নের ঘর। হাসিনা আরও বলেন, "এইহানে ঘর পাওয়ার পর জীবনডা পাইলডা যায়। ডিসি স্যার একটা গরুও দেয় মোরে। হেই গরু পালন হরি। মাইয়াডারে বিয়া দিছি সবাইর সহযোগিতায়। এহন হে ভালোই আছে। মোর এখন জীবন কাডে এই গরু ২ ডার লগে।

তবে এদের মধ্যে রিনা বেগমের গল্পটা একটু আলাদা। ৪০ বছর বয়সী রিনা স্বামীসহ কাজ করতে ঢাকার কোন এক গার্মেন্টেসে। সাবলেটে একটা রুম ভাড়া নিয়ে থাকতেন। দুজনের আয়ে সংসার চলে মোটামুটি চলে যেতো। কিন্তু দ্বিতীয় সন্তান হবার সময় শারীরিক সমস্যার কারণে চাকরি ছেড়ে গ্রামে চলে আসতে হয় রিনাকে। তখন থেকেই গ্রামে থাকতেন তিনি। দুজনের আয় যখন একজনে নেমে আসে তখনই সংসার চালাতে হিমশিম খেতে থাকে তারা। স্বামীর একার পক্ষে

সংসার চালাতে কষ্ট হতো। বলছিলেন, “পয়লা পয়লা মুই ১৬০০ টাহা পাইতাম। আস্তে আস্তে হেইডা চার হাজার টাহা হয়। স্বামীর বেতনের লগে মোর বেতন একলগে হইররা মোটামুটি ভালোই যাইতে। যতডু অয় সাহায্য অইতে। পোরথম সন্তান হওয়ার ষোল বচ্ছর পর মোর দ্বিতীয় সন্তান হয়। শারীরিক সমস্যার লাইগ্গা মোর চাকরিটা ছাইড়া দেওয়া লাগে। হেইরপর মুই গৌড়িচন্নায় আইয়া পরি। হেইকাল অইতেই সমেস্যা শুরু হয়। ঢাকায় স্বামীর খরচের লগে এইহানে মোর আরেক্কুয়া খরচ যোগ হইলে। এইহানে মুই ২ রুমের এউক্কা বাসা ভাড়া লই। মাসে দুই হাজার টাহা দেওয়া লাগদে। স্বামী যা টাহা পাডাইতে হ্যা দিয়া চলা কঠিন অইয়া গ্যালে। বাপ ভাইরা সহযোগিতা হরতে যতডু পারতে। পরে ২০১৩ সালে যেকালে হুনি সরকার মোগো ঘর দেবে হেইকালে মুই যাইয়া নাম দিয়া আই। হ্যারপর তো এইহানে ঘর পাইলাম। দুই বচ্ছর অয় মুই এইহানে আছি। লগে দুই শতক জমিও পাইছি। সবচাইতে যেডা বড় সুবিধা অইছে যে নিজের এউক্কা গর অইছে। নিজের নাহান গুছাইছি ঘরডারে। টাহা জোমাইয়া টিভি কিনছি। স্বামীর এহন আগের নাহান মোরে টাহা দেওয়া লাগেনা। বাচ্চাডারে পড়ালেহা হরাইতেছি। আবার ডিসি স্যার মোরে সেলাই মেশিন দেছে। মুই তো আগে গার্মেন্টসে কাম হরতাম। তাই এহন সেলাই মেশিন দিয়া জামা কাফুর বানাই। এইহানে যারা থাহে হেগো জামা বানাইয়া দি। কিছু টাহাও ইনকাম অয়। নিজের টাহা দিয়া এইহানে নিজে চলি। স্বামীর টাকা জোমাইয়া থুই।” রিনা বেগম এখানের আর ৫ টা পরিবারের চেয়ে ভালো অবস্থায় আছেন। যাদের অবস্থা খুব খারাপ তাদের জন্য কি করেন জানতে চাইলে বলেন, “এইহানে অনেকেই আছে য্যাগো কোন ইনকাম নাই। মোরা এট্টু ভালো যারা আছি হ্যারা ওগো সাহায্য হরি। চাউল দি। টাহা দি। অসুস্থ অইলে ঔষাধ কিন্না দি। মোরা পোরথোমে ত্রিশডা পরিবার এইহানে আইছি। হ্যাগো সবাইর লগে মোগো খুব ভালো সম্পর্ক। পরে য্যারা আইছে ভাবছালাম হ্যারা না জানি কেমন অয়। একলগে চলতে পারমু কি না। কিন্তু না হ্যারা ব্যাবাক্কে ভালো। কেউর

কোন সমস্যা অয়না। যেকালে হুনছালাম হিজড়ারাও এইহানে আইবে হেকালে এট্টু ডর লাগজেলে। এহন আর কোন ডর নাই। ওরা মোগো লগে এমন বাবে মিশশ্যা গ্যাছে যে ওগো আলেদা মনে অয়না। এইহানে পুহুইর আছে। মাছ ধরলে মোরা ব্যাবাক্কে মিল্ল্যা ভাগ কইররা লই। সরকারকে দইন্যবাদ মোগো এইরহম সুবিধা দেওয়ার লইগ্গা। আর ডিসি স্যারওে ধন্যবাদ মোরে মেশিন কিন্যা দেওয়ার লাইগ্গা। মোরা আগের চাইতে ভালো আছি।

এরকম বহু লোককে সমাজের মূল স্রোতে ফিরিয়ে এনেছে খাজুরতলার এই আশ্রয়ণ প্রকল্প। ৪৪ বছর বয়সী ইউসুফ আলী তেমনই একজন ভাগ্য বিড়ম্বিত মানুষ। কিন্তু এই আশ্রয়ণ প্রকল্প তার ভাগ্যের চাকা ঘুরিয়ে দিয়েছে। ইউসুফ বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন রকমের কাজ করতেন। কখনো টাইলস-মোজাইক বসানো, কখনো ওয়াসার পানির লাইন বসানো আবার কখনো লঞ্চের হেলপারি। জীবনের বেশিরভাগ সময়ই তার ঢাকায় কেটেছে। বিয়েও করেছেন ঢাকায়। ভীষণ পরিশ্রমী আর শক্ত সামর্থ্যের হবার কারণে দ্রুতই মালিকের পছন্দের পাত্রে পরিণত হতেন। কাজ পেতেও সমস্যা হতোনা তার। যা আয় করতেন তা দিয়ে নিজের সংসার চালিয়ে বাড়িতে বাবা মায়ের কাছে পাঠাতেন। কিন্তু এই সুখ বেশিদিন সইলোনা। ২০১০ সালে একরাতে তিনি ওয়াসার লাইনের পাইপ বসাচ্ছিলেন। রাস্তার পাশে গর্ত খুড়ে তিনি গিয়েছিলেন গর্তের ভেতরে। হঠাৎ একটা সিএনজি এসে পরলো সেই গর্তে। একেবাওে মৃত্যুর মুখ থেকে ফিরে এসেছেন তিনি। ইউসুফ বলেন, “মনে অইল্লে মইররাই যামু। এমোন ভাবে সিএনজিডা মোর মাথায় আইয়া পরলে যেন পুরা দুনিয়াডা আন্দার হইয়া গ্যালে। ব্যথায় মনে অইতেছেলে মাথাডা কেউ কাইট্টা হালাউক। আর সইতে পারতেছেলাম না। মোর আর কিচ্ছু মনে আল্লে না। পরে হুনছি লগে যারা আল্লে হ্যারা মোরে টাইন্না দইররা হাসপাতালে লইয়া যায়। হেইরপর এট্টু সুস্থ অইলে বাড়ি আইয়া পরি। ওরা কেউ মোরে চিকিৎসার একটা টাহাও দেয় নাই। মাথার ব্যথা মোর এহোনো আছে। আচমকা মাথা চাপ দিয়া ওডে। রোইদে আধা ঘণ্টা

কাম হরলেই রগ শক্ত অইয়া যায়। মাতায় যন্ত্রনা শুরু অয়। হেইরহম কোন কাম হরতে পারিনা। বউ গুরাগারা লইয়া বিপদে পইররা গ্যালাম। মানের জমি চইয়া চলতাম। মাঝে মধ্যে রাজ মিস্ত্রিগো লগে ইট বালি টানতাম। খুব কষ্ট অইতে। ভারী কোন কামও হরতে পারতাম না। দুইটা গুরাগারা হউরবাড়ি পাডাইয়া দেছালাম। একদিন ইউএনও অফিস থেইকা ফোন কইররা ভোটার আইডি কার্ড লইয়া দেহা করতে কয়। মুই যাইয়া একডা ফরম পূরণ হরি। কয়যে মুই সরকারি ঘর পাইতে পারি। পরে তো কপালের জোরে গরডা পাইয়া গ্যালাম। নিজের এউক্কা গর অইলে। খুশীতে বউ গুরাগারাসহ ওডলাম। মোর বাহেরও ক্ষমতা আল্লে না এইরহম এউক্কি গর বানাইন্নার। গরের লগে বাতরুমও আছে। এইহানে যারা থাহে মুই গ্যারান্টি দিয়া কইতে পারি হ্যারা কহনো এইরহম রুমে থাহে নাই। দুইডা গরের লগে এট্টু জায়গা আছে। হেইজায়গায়া মরিচ, শাক লাগাইছি। পেরতেক দশ বাড়ির লইগ্গা এউক্কা ডিপকল দেছে। একছের ঠান্ডা সুন্দার পানি। সরকারের এই কামডারে মুই ধইন্যবাদ জানাই। প্রধানমন্ত্রী মোগো নতুন জীবন দেছে।” বলতে বলতে কান্নায় ভিজে যায় ইউসুফের চোখ। চোখ মুছে আবার বলতে শুরু করেন, “ঘরে ওডার পর বুইনের দাইরদা ১০ হাজার টাহা দার হরি। গরের লগে এউক্কা ছোট্ট দোহানদি। এইহানে যারা থাহে হ্যারা ব্যাবাক্কে মোর কাষ্টমার। হ্যারাই কেনাকাডা হরে। অনেকে কষ্ট অইলে বাহি নেয়। পরে আবার ফেরত দিয়া দেয়। হিজড়ারাও টাহা দিয়া জিনিসপত্র কেনে। পেরতেকদিন ১৫০০/১৭০০ টাহার উপরে ব্যাচা বিক্রি অয়। এহন মুই ভালো আছি। মাঠে কাম হরা লাগেনা। মাতা ব্যতাও কমছে। হাঙ্গোদিন দোহানেই বইয়া থাহি। বুইনেরে মুই এহন ধারের টাহা এট্টু এট্টু হইররা শোধ দেওয়া শুরু হরছি। বড় পোলাডারে মাদ্রাসায় পড়াই।”

২৭ বছরের আসমা বেগম। বয়স খুব একটা নাহলেও এই অল্প সময়েই জীবনের উত্থান পতন দেখে ফেলেছেন। তার স্বামী ফুটপাতে দোকানদারি করতেন। তিনিও মানুষের বাড়িতে কাজ করতেন। ঘর ভাড়া দিতে না পারায় বাড়িওয়ালা

তাদের বের করে দেয়। পরে তার মা স্বামী সহ নিজের বাড়িতে নিয়ে যান। ঘরের সমস্যার সমাধান হলেও আসমার স্বামীর ঘর জামাই থাকতে ভালো লাগতোনা। আসমা বলে, "মোর স্বামী একছের ভালো মানু। হে কাম হরতে। গর জামাই থাহা হ্যার পছন্দ অইতে না। মানে আসাআসি হরতে। গর জামাই কইয়া মজা লইতে। কিন্তু হের যে টাহা ইনকাম অইতে হেইডা দিয়া ঘর ভাড়া হইররা মোরা থাকতে পারতে আছালাম না। এইরম সময় এইহানের মেম্বার মোর স্বামীরে বোলাইয়া নাম দেতে কয়। হেইরপর মোরা এইহানে গর পাই। মোর হেইকালে ছোডো গুরাগারা। মোরা তিনজনে বাহের বাড়িদ্দা আইয়া এইহানে উডি। কি যে ভালো লাগদে আছেলো মোর। আসমা বলতে থাকেন, "মুই আগে এউক্কা গরে ভাড়া আল্লাম। ওই বাড়িওয়ালা মাতারি একছের ভালো আল্লে। হে মোরে গরে বইয়া না থাইক্কা সেলাইর কাম হরতে কয়। মুই হেইকালে স্বামীর দাইরদা তিনহাজার টাহা লইয়া একটা পুরান সেলাই মেশিন কিনি। হেইর পর হের মোবাইলদা ইউটিউব দেইক্কা দেইক্কা সেলোয়ার, কামিজ বানাইন্না হেকলাম। পয়লা নিজের লইগ্গা বানাইতাম। ঠিক অয় কি না দেহার লইগ্গা। হেইরপর আশ পাশে দুই একজনেরে বানাইয়া দেতাম। কিন্তু মেশিনডা ক্যাল ক্যাল নষ্ট অইয়া যাইতে। হেইতে ঠিকমতো কাম হরতে পারতাম না। এইহানে আওয়ার পর ডিসি স্যার হেইডা হোনছে। হেইরপর মোরে এউক্কা নতুন সেলাই মেশিন কিন্না দেছে। মুই আগেরডা ভাঙ্গারি হিসেবে বেইচ্চা দিয়া এহন নতুন সেলাই মেশিনডা দিয়া কাম হরি। মুই এতো খুশী আল্লাম যেইদিন মেশিন পাইছি হেইদিনই সেট কইররা কাম শুরু হইররা দিছি। এহন মুই বালিশের কভার, থ্রিপিছ, সেলোয়ার কামিজ, ব্লাউজ, পেডিকোট সব বানাইতে পারি। আশ্রয়ণের মানেরা মোর দারে জামা বানাইয়া লয়। বাইরের মানেও আয় কাম হরাইতে। অনেকেই জানে যে মুই মেশিন চালাই। এইহানে আওয়ার পর মুই মেশিন চালাইয়া মাসে ৫/৬ হাজার টাহা ইনকাম হরি। স্বামী যে কয় টাহা ইনকাম হওে হের লগে মুইও ইনকাম হরি। পোলাডা বড় অইতে আছে। এহন মুই ওরে নার্সারীতে ভর্তি হইররা দিছি।

জীবনডাই মোর বদলাইয়া গ্যাছে। হাঙ্গো জীবনতো মুই মানের বাড়ি আল্লাম। টাহার লইগ্গা একদিন মোগো বাড়িদ্দা বাইর হইররা দেছেলে। হেই মোরাই এহন বাড়ির মালিক।

৪০ বছরের ইকবাল হোসেন জন্মগত ভাবেই শারীরিক প্রতিবন্ধী। দুপায়ে তিনি ঠিক মতো চলতে পারেন না। তারা ৫ ভাই বোনের মধ্যে দুজনেরই এই সমস্যা। তাই বাবা মাও তাদের সব সময় আলাদা করে রাখতো। ইকবাল বলেন, "ছোডো অইতে এল্লা এল্লা বড় অইছি। বন্দুগো লগে মেশতে পারিনাই। হ্যারা মোওে খেলায় লইতে না। বাপ মায় আলেদা হইররা রাখতে। অন্য ভাইগো নাহান মোরে বালোপাইতেনা। মানের জমিতে মোরা ছোডো এউক্কা গরে থাকতাম। ঝড় বইন্নায় ঘরের চাল উইররা যাইতে। হেইরপর জমির মালিক মোগো গর ভাইঙ্গা দেল্লে। মোরা আরেক জায়গায় জাইয়া গর ভাড়া লইয়া থাকতাম। হেইকালে কষ্ট আরও বাড়ছেলে। মোরে সবাই খোডা দেতে। কোন কাম হরতে পারতাম না। পরে এউক্কা ফ্লাস্ক কিন্না চা বানাইয়া ব্যাচতাম। বেশি আডতেও পারতাম না। হেইর লইগ্গা ফুটপাতে এক জায়গায় বইয়া বেচতাম।০ ম্যালা কষ্টে হারাদিনে এক ফ্লাস্ক চা বেচতাম। পেরতেকদিন ৩০০/৪০০ টাহা বেচতে পারতাম। কিছু টাহা আইন্না বাড়ি দেতাম। নিজের দারে কিছু টাহা যোগাড় হরতাম।" এভাবেই চলতে থাকে ইকবালের জীবন। পরে স্থানীয় এক মেয়ের সাথে বিবাহ বন্ধনে আবদ্ধ হন। বিয়ের পরে বউসহ আলাদা থাকায় খরচও বেড়ে গেলো ইকবালের। ইকবাল বলতে থাকে, "মাসে ১৫০০ টাহা ভাড়া দেওয়া লাগদে মোর। হেই হিসাবে তো ইনকাম নাই। জোয়ান বউ। হ্যাওে তো আর রাস্তায় থুইতে পারিনা। হেও মানের ঘরে ঘরে কামাই রোজগার হরতে। বউ হারাদিন কইতে মোগো এউক্কা নিজের গর অইলে এই কষ্ট আর থাকতে না। এউক্কা গর আল্লে মোগো স্বপ্ন। হেই স্বপ্ন পূরণ হরছে প্রধানমন্ত্রী। যেইদিন মুই গরটা পাইছি হেইদিন এই ঘরের দরজা দইররা কানছি।" এই আশ্রয়ণ প্রকল্প ইকবালকে শুধু থাকার জায়গা দিয়েছে তা নয়। বরং তাকে নতুন করে কাজের

পথও দেখিয়েছে। আগ্রহের কারণেই আগে ইকবাল মানুষের টুকটাক ইলেকট্রিকের কাজ করে দিতো। সেটাই এখন তার নতুন কর্মসংস্থান। ইকবাল হাসতে হাসতে বলেন, " এই দরেন কেউর বাল্ব লাগান লাগবে, ফ্যানডা গোরেনা, লাইট ফিউজ অইয়া গ্যাছে। এই টুকটাক কাম গুলা পারতাম। এইহানে আওয়ার পর ব্যাবাকতো নতুন গর। ব্যাবাক্কে মোওে বোলাইতে। কাম হরাইয়া লইতে। কিছু টাহাও দেতে। এইরহম হইররা মুই কারেন্টের কামডা শুরু হরি। আস্তে আস্তে বাইরের মানেও মোরে কামে বোলায়। এহন মুই পেরতেকদিন প্রায় দুই অইতে আড়াই হাজার টাহার কাম হরি। আগের চাইতে মুই ম্যালা ভালো আছি। পেরথম দিকে মাল আনতে কষ্ট অইতে। এহন মুই নিজে টাহা যোগাড় হইররা একটা সেকেন্ড হ্যান্ড সাইকেল কিনছি। আর কোন কষ্ট নাই। পেরতেকদিন যা যা লাগে সাইকেলে হইররা কিন্না লইয়া আই। আর কাম হরি। মোর মাইয়া আছে তিনডা। হের মদ্দে বড় দুইটা মাইয়া লেখাপড়া হরাই। সবকিছু মিল্লা মুই এখন মহাশান্তিতে আছি। এইহানে মুই হিজড়াগো কাম হইররা দি। হিন্দু মুসলমান ব্যাবাক্কের কাম হরি। ব্যাবাক্কের লগে মোর একছের ভালো সম্পর্ক অইয়া গ্যাছে। মোরা এইহানে সবাই মিল্লা শান্তিতে আছি।"

পাকিস্তান আমলে শোষণ ও অন্যায়ের প্রতিবাদে বাংলার আপামর জনতা বেছে নিয়েছিল সংগ্রামের পথ। মাতৃভাষায় কথা বলা ও মাথা উঁচু করে বেঁচে থাকার অধিকার রক্ষার জন্য জাগ্রত সচেনতাবোধ, আবহমান কাল ধরে চলে আসা স্থানীয় কৃষ্টি রক্ষা এবং জাতিগত স্বাতন্ত্র সমুন্নত রাখার জন্য বাঙালি জাতির কাছে অপরিহার্য হয়ে উঠেছিল একটি স্বাধীন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করা। আর এই দীর্ঘ মুক্তি সংগ্রাম ও স্বাধীনতা আন্দোলনের পথে জাতিকে ধাপে ধাপে এগিয়ে নিয়ে গেছে আওয়ামী লীগ। এবারও তার ব্যতিক্রম নয়। বঙ্গবন্ধুর হাতে স্বাধীন বাংলাদেশের মানুষের ভাগ্য উন্নয়নে, প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার হাত ধরে শত সাফল্যের পথ দেখিয়ে এক যুগেরও বেশি সময় ধরে এগিয়ে চলছে বাংলাদেশ। অনন্য পথচলার

মুকুটে যুক্ত হওয়া পালকের অনন্য এক নাম মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর আশ্রয়ন প্রকল্প। অপ্রতিরোধ্য গতিতে অদম্য ও স্মার্ট বাংলাদেশ গড়ার নেপথ্যে এই "ম্যাজিক্যাল লিডার" যেখানেই হাত দিয়েছেন সেখানেই যেনো সোনা ফলেছে। কৃষি থেকে শিল্প, বাণিজ্য থেকে বিনিয়োগ, বৈদেশিক আয় থেকে কর্মসংস্থান সকল সেক্টরের সাফল্যের সঙ্গে আশ্রয়ন প্রকল্পের মত সামাজিক নিরাপত্তায়ও যিনি ছড়িয়ে দিয়েছেন শান্তির সুবাতাশ। স্রোতের বাইরে থাকা মানুষ গুলোর ঠাঁই হয়েছে সমাজের মূল স্রোতে। সুতরাং একথা বলাই যায়, বাঙালি জাতির হাজার বছরের শৃঙ্খলমুক্তির চূড়ান্ত সিঁড়ি হয়ে উঠেছিল যে মুক্তিযুদ্ধ, তার মূল উদ্দেশ্য ছিল মানুষের জীবনমান উন্নয়ন আর বেঁচে থাকার মানবিক অধিকার, আর এই আশ্রয়ন প্রকল্প যেনো বঙ্গসন্ধুর সেই স্বপ্নের চূড়ান্ত বাস্তবায়ন। এজন্য খাজুরতলা আশ্রয়ণ প্রকল্পের মানুষের অভিন্ন উচ্চারণ, "পিতার হতে স্বাধীনতা, কন্যার হাতে দেশ, আশ্রয়ন প্রকল্পে ঘর পেয়ে আসলো শান্তি সুখের রেশ"।